মহাশ্বেতা দেবী, চোট্টিমুণ্ডা ও তার তীর: লোকজীবনের মহাকাব্য

ড. তপন বর

(বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, রামসদয় কলেজ, আমতা হাওড়া)

এক অলৌকিক বাস্তব সত্যের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে মহাশ্বেতা দেবীর 'চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর' উপন্যাসে। উপন্যাসটি ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয়। এটি মহাশ্বেতা দেবীর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য লেখা এবং এতাবৎকালের মুদ্রিত উপন্যাসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। চোট্টি মুন্ডা-চোট্টি নদীর নামে নাম। প্রতীকী। এটা প্রচলিত কোন ইতিহাসের কাহিনী নয়। চোট্টি এক কল্পিত চরিত্র। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লেখিকা নিজেই বলেছিলেন : 'Chotti is my best beloved book'.[১] তিনি আরও বলেছেন—'চোট্টি মুন্ডা—তাঁর অভিজ্ঞতার আকর গ্রন্থ। উপন্যাসটি একই সঙ্গে একটি মানুষ, তার সমাজ, একটি আন্দোলন। দীর্ঘ ব্যাপ্ত একটি সময় এবং সেই সময়ের রাজনীতি, উত্থান-পতন ও অবক্ষয়ের বিশ্লেষণী বৃত্তান্ত। মুন্ডা সমাজের

১। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাককে দেওয়া সাক্ষাৎকার।—মহাশ্বেতা দেবী।

অলিখিত স্মৃতি-ইতিহাস উপন্যাসটিতে সারাক্ষণ পটমোচনের ঢঙে এগিয়ে নিয়ে গেছেন মহাশ্বেতা। আর উপন্যাসটির এই গঠন কৌশল লক্ষ্য করে আমাদের এই উপন্যাসকে পটোগান হিসাবে শনাক্ত করার ইচ্ছা হচ্ছে। যদি আমরা উপন্যাসটিকে একটি সমগ্র পট হিসাবে ধরে নিই তবে দেখব সেই পটের মধ্যে আছে নানান লোকজ উপাদান যা মুন্ডাদের জীবন কে আরও স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত করে তুলেছে। আমরা জানতে পেরেছি তাদের জীবন সংগ্রামের মূল কারণ কী?

আমরা জানি অত্যাচারিতের ইতিহাস লেখার মত তেমন বর্ণমালা আজও আবিষ্কার হয়নি। তাই তাদের বৃত্তান্ত ঘোরে ঠোঁটে, মুখে মুখে লোকসংস্কৃতির নানা উপাদানে—কখনো লোক গানে গানে কবিগান ও কীর্তনে। এই উপন্যাসে চোট্টির লীলা কীর্তনের কবিরাজ গোস্বামী হলেন স্বয়ং মহাশ্বেতা দেবী।

উপন্যাসটি আঠারোটি অধ্যায়ে গ্রথিত। এই উপন্যাসকে আমরা যদি অন্তর থেকে গ্রহণ করতে চাই তবে অবশ্যই পড়তে হবে ১৯৭৭ খ্রীঃ প্রকাশিত এই পর্বের আর একটি অন্যতম উপন্যাস 'অরণ্যের অধিকার'। বলা যায় দ্বিতীয় উপন্যাসটি প্রথম উপন্যাসের অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিক আবির্ভাব। 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসের নায়ক বীরসা মুন্ডার জন্ম হয়েছিল ১৮৭৫ খ্রীঃ। তার নেতৃত্বে আদিবাসী মুন্ডাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন এক ঐতিহাসিক বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল—১৮৯৫-১৯০০ খ্রীঃ মধ্যে। ১৯০০ খ্রীঃ, ৯ জুন রাঁচি জেলে তার প্রয়াণ। রিপোর্টে লেখা হয়—সুগানা মুন্ডার ছেলে বীরসা মুন্ডা, বয়স পঁচিশ, এশিয়াটিক কলেরায় মৃত্যু। এই মৃত্যুর পর একটা বিশ্বাস সমগ্র আদিবাসী সমাজে ছড়িয়ে পড়েছিল মন্ত্রের মতো:—

'বীরসার মরণ নাই, উলগুলানের শেষ নাই'।

আদিবাসী বিদ্রোহের এই ধারাবাহিক ইতিহাসকে লেখিকা 'চোট্টি মুন্ডা ও তার তীর' উপন্যাসে প্রাণিত করেছে। তিনি প্রমাণ করেছেন ব্যক্তির মৃত্যু হতে পারে কিন্তু বিদ্রোহের কোনে শেষ নেই। বিদ্রোহের ধ্বজা এক মানুষের কাঁধ থেকে অন্য মানুষের কাঁধে চলে যায় মাত্র। তাই যেদিন বীরসার মৃত্যু হল ঠিক সেই সময়েই জন্ম নিল চোট্টি মুন্ডা। উপন্যাসের প্রথমেই লেখিকা তাঁর সম্পর্কে বললেন—

'লোকটির নাম চোট্টি মুন্ডা। চোট্টি একটি নদীর নামও বটে। নদীর নামে ওর নাম হবার পেছনে একটি গল্প আছে। সব সময়ে ওকে নিয়ে গল্প গজাচ্ছে'।[২]

লেখক অতীত চারিতায় গল্পের কাঠামো তৈরী করেছেন। আবার অতীত থেকে বর্তমানে এসেছেন চোট্টিকে কেন্দ্র করে। আর এই গল্পের মাধ্যমে উঠে এসেছে মুন্ডারা কীভাবে অত্যাচারিত হয় এবং স্বাধীনতার পূর্বাপর প্রায় আট দশক ধরে তারা

২। মহাশ্বেতা দেবীর রচনা সমগ্র—নবম খণ্ড-দেজ-পৃষ্ঠা-২১।

কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে। অনেক কথকতা উঠে এসেছে এখানে যেগুলি সবই তাদের জীবন সমস্যা নির্ভর। বিভিন্ন ভাবে তারা শোষিত হয়---কখনো মালিক-মহাজান, কখনো পুলিস প্রশাসন আবার কখনো বা রাজনৈতিক ক্ষমতা লোভীদের কাছে। এখানে শোষকের ভূমিকায় টাইপ চরিত্র হিসাবে উঠে এসেছে তীরথনাথ লালা আর তার বাবা জোতদার বৈজনাথ লালার কথা। উপন্যাসে দেখানো হয়েছে কীভাবে তারা করজ চক্রবৃদ্ধি ও সুদ বেঠবেগারী-র মাধ্যমে বংশ পরম্পরায় দাস করে রেখে পুলিশ প্রশাসন ও রাজনৈতিক দাদাদের সাহায্যে নিম্নবর্গকে শোষণ করে চলে।

একসময় লেখিকা চোট্টির গল্প বলতে বলতে আরও অনেক গল্পের প্রসঙ্গ এসেছে—যে গল্প গুলি লোকসংস্কৃতির অন্যতম উপাদান—যা এই উপন্যাসকে অনেকখানি সমৃদ্ধ করেছে। যেমন দুখিয়ার গল্প, ঘর ভেঙে দেওয়ায় তসিলদারকে হত্যা করা পুরানের গল্প বা গ্রামছাড়া সুখা বা ভরতের গল্প। তবে কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছে এই উপন্যাসের মূল চরিত্র অবশ্যই চোট্টি। লেখকের নিজের ব্যাখ্যায়, —বিহারের মুন্ডা গ্রাম। সেখানে ছয়ের দশকেও বীরসার উলগুলান তাদের আলোচনার বিষয়, সেখানে মহাশ্বেতা স্থাপন করছেন তার কাহিনিকে। তাঁর মতে—

'Chotti Munda, the hero of your novel, is a figure of continuity, from the Ulgulan, to the Emergency and Post-Emergency.'[৩]

Emergency and Post-Emergency পর্বে মস্তানদের প্রতিনিধি হিসেবে কাহিনিতে এসেছে রোমিও, দিলদার পহলোয়ানদের কার্যকলাপ। মস্তানদের দাপট বড় লোকদের উপর ছিলনা তা নয় কিন্তু অসহায় চোট্টি বা ছগনের জীবনের উপর অত্যাচার মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো হয়ে দেখা দেয়। নকশালরা বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর শপথ নিয়ে প্রবেশ করে এই অঞ্চলে, অধিকার অর্জনের লড়াইয়ে আদিবাসীদের ও সামিল করে। কিন্তু দুর্ভাগ্য একসময় মস্তানতন্ত্রকে দমন না করে নকশালদের দমন করতে এসে যায় 'ইয়াড-ইনভস্টিগেট-অ্যাপ্রিহেনড-ডেস্ট্রয়, শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় চোট্টি। উপন্যাসটির শেষাংশে লেখিকা তা সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন—

'চোট্টির বউ ঢলে পড়ে পাশে। ছগন বাজিয়ে চলে নাগারা, মুখে তার দুর্বোধ্য হাসি।'

এস.ডি.ও শুকনো মুখে বললেন, তুমি! তুমি তীর ছুঁড়েছ? তুমি কি দেখতে পাও নিশানি? চোট্টি নির্মল হাসে ও বলে, দেখাতেছি—তার পর মুন্ডারী ভাষায় দ্রুত

৩। Devi Mahasweta, Chotti Munda and his arrows (Translated and introduced by Gayatri Chakraborty Spivak) Blackwell Publishing (U.K.) 2003 P-IX

বলে, ধানী মুন্ডা! তুমার নাম উঠায়ে তুমার তির ছুঁড়তেছি আজ। নিজের কাছ নিজে সাচাই থাকিবার লাগি।

চোট্টি লঘু ও ক্ষিপ্র পায়ে চলে আসে নিশানির উল্টো দিকে। সকলকে বলে, কুনো ভয় নাই তুরাদের। তারপর তির ছোঁড়ে লক্ষ্যভেদ করে।

"তারপর সে দাঁড়িয়ে থাকে নিরস্ত্র। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে চিরকালের সঙ্গে মিলে মিশে হয়ে যায় নদী কিংবদন্তী, অবিনশ্বর। একমাত্র মানুষই যা হতে পারে। সকল আদিবাসী আন্দোলনকে নিয়ে আসে বর্তমানে, এখন আদিবাসী ও তপশিলি যুক্ত আন্দোলনে"।[৪]

আদিবাসী মুন্ডাদের জীবনের শোষণ-বঞ্চনার এই দৃশ্যসজ্জা বা বিবৃতি—রচনার জন্য বেছে নিয়েছেন তাদের সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তি, গল্পকথা, গান ইত্যাদিকে। কেন এসব লোক-উপাদান মহাশ্বেতা দেবীর আখ্যানে অন্যতম সামগ্রী সে সম্পর্কে স্বয়ং লেখকের উপলব্ধি:—

'These people do not find anyone writing about them...they compose the stream of event into song...their hisotry is like a big flowing river going some where, not about a destination."[৫]

সমগ্র উপন্যাস জুড়ে লেখিকা লোক-উপাদানের সুন্দর ব্যবহার করেছেন। তাই কথাকার অনায়াসেই হয়ে উঠেছেন কথকথাকার। লোক উপাদান নির্ভর লোক জীবনের যথার্থ রূপকার রূপে বিবেচিত হয়েছেন তিনি। এখন আমরা এই উপন্যাসে ব্যবহৃত লোক উপাদান গুলির ব্যবহার ও তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করতে পারি।

কথকতার ভঙ্গি—

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'অরণ্যের অধিকার' উপন্যাসটির সঙ্গে আলোচ্য 'চোট্টিমুন্ডা ও তার তীর' উপন্যাসটির নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। সেদিক থেকে অন্তত এই দুটি উপন্যাসের গল্প বলার রীতি প্রায় একই রকম। কথোপকথনে ঢাকা এই রীতি। বক্তার কথা শ্রোতা মন দিয়ে শুনছেন। মাঝে মাঝে দু-একটি প্রশ্ন করে তার একনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছেন। আলোচ্য উপন্যাসে চোট্টিমুন্ডা খুঁজতে খুঁজতে একদিন ধানীকে পেয়ে যায় জঙ্গলের গহিনে। সেটা ১৯১৫ সালের কথা। চোট্টির বয়স সে সময় পনেরো বছর। একটা কুন্ডীর ধারে পাথরে ধানী বসেছিল। চোট্টিকে দেখে সে মাথা তোলে এবং কথা বলে। উভয়ের কথোপকথন রীতি বেশ লক্ষণীয়:—

৪। মহাশ্বেতা দেবী রচনাবলী-নবম খণ্ড-দেজ-পৃষ্ঠা-২৪৪।

৫। Ibid P - X.

"চোট্টি ওর পা ধরেছিল
পা ধরিস কেন?
আমাকে তির ছুঁড়তে শেখাও
আমি?
হ্যাঁ। তুমি তীরন্দাজদের হরমদেও।
কেন শিখতে চাস? তির তো সকল মুন্ডাই ছোঁড়ে। আমি তোকে
কি নতুন বিদ্যা শিখাব?
আমি চোট্টি মেলায় জিততে চাই।

চোট্টির জ্বলজ্বলে মুখ দেখে ধানী হঠাৎ হেসেছিল। বলেছিল কী করে শিখাব? তির ধরলে পুলিশ
আমাকে আবার জেহেলে নেবে কেন?
সে অনেক কথা কথাগুলো বলতে চাই। কিন্তু শোনার মানুষ নাই।..."[৬]

অর্থাৎ গল্পের যেন শেষ হয়না। একটার পর একটা গল্প বেরিয়ে আসে। সমগ্র উপন্যাসটি যেন গল্পের মালা। আর মালার ফুলগুলি যেন এক একটি গল্প—সেগুলি একই সূত্রে গ্রথিত উপন্যাসের শুরুতেই লেখিকা উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এই গল্পের ইঙ্গিত দিয়েছেন ঃ—

চোট্টি একটি নদীরও নাম বটে। নদীর নাম ওর নাম হবার পেছনে একটি গল্প আছে। সব সময়ে ওকে নিয়ে গল্প গজাচ্ছে।

এই কথোপকথনে নাটকীয়তা আর একটি বৈশিষ্ট্য। পুরাণের ঘর ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে অন্যায়ভাবে। পুরাণ সে কথা চোট্টিমুন্ডাকে জানায় ঃ—
"...তা এসে যা দেখলাম সে আশ্চাজ্জ কথা
কী দেখলি?
ঘরটা-গোহালটো-মাচংটা-কিছু নাই। চষা
জমি যেমন। ফিরিবদ্যি। সেজন্য ঘর-আঙিনা
সব হাঁসি মাঢ়ায়ে দিচ্ছে। আর তার মুন্ডাদের
কোড়া মারি বলিছে, উজমিনে কাঁটা গাড়ি দে
তারা দিচ্ছে?'

নাটকীয়তার পাশাপাশি আছে বিস্ময়। বিস্ময় এই কারণে যে জীবনের কী দারুন অসহায়তা নিয়ে তারা বেঁচে থাকে তা ভাবলে সত্যিই অবাক হতে হয়। লেখকের এই ধরনের বিবরণ সমগ্র উপন্যাস জুড়ে ছড়িয়ে রযেছে। এই বিবরণগুলি হয়ে উঠেছে তাঁর ন্যারেটিভ-ষ্টাইলও। যেমন;—

৬। মহাশ্বেতা দেবী—রচনাবলী নবম খণ্ড-দেজ-পৃষ্ঠা-২৫-২৬।

"এই ছয় বছরে চোট্টির জীবনে উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা
ঘটেনি। মুন্ডাদের জীবনে ঘটে না"।[৭]

বা,

"ততদিনে পঞ্চাশের দশক ষাটের দশকের কাছে এগোচ্ছে।
একদা মধ্যাহ্নকালে জানা গেল, রাজার শিকার খেলায়
মদত দিয়ে ফিরছিল। তসিলদার সিং। ঘোড়ায় চড়ে সে সময়
তার ফিটে তির বেঁধে। তিরের মুখে বিষ ছিল।
তসিলদার ঢলে পড়ে"।[৮]

পাঁচালী—

লোক উপদানের অনুসন্ধানে এরপর আমাদের নজর পড়ে আখ্যান কথা বৃত্তান্তে। আখ্যায়িকা বা পাঁচালীর বয়ানে। আর তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে লোকভাবনা কিংবা লোকায়ত কথা। তার মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক এই লোক জীবনকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এতদিন চোট্টিমুন্ডা পাথর হয়ে বসে থাকত। যখন ধানীকে গানে ও গল্পে ফিরে পেল। তখন সে পাথর থেকে আবার মানুষ হয়ে উঠেছে। তবে ধানী মুন্ডা সম্পর্কে সমগ্র মুন্ডা সমাজের কাছে যে বার্তা ছিল তা লেখিকা গানে গল্পে প্রকাশ করলে এই ভাবে ঃ—

"দানী তুমি জেহেল থেকে বেরালে
একটা আগুনের তীর তোমায় পথ দেখাল,
মুরডি এলে তুমি
যখন জেলেহ থেকে বেরালে॥
মুরুডিতে তুমি যাদের কাছে থাকলে তারা পুর্ণ্যাগ্ন
মুরুডির জল-আকাশ-মাটি পবিত্র হয়ে গেল।
ধানী তুমি মুরুডিতে থাকলে॥
ধানী তোমাকে ধরতি-আবা ডাকল
তারদেহের মরণের দিনে সৈলরাকাবে
সে তার শিষ্যদের খুঁজতে আসে।..." [৯]

মুন্ডাদের শত্রু গোরমেন্। গোরমেন সম্পর্কে মুন্ডাদের মনে একটা বিতৃষ্ণার ভাব মজ্জাগত। কিন্তু সেই গোরমেন সম্পর্কে কিছুটা ভিন্ন সুর শোনা গেল মেয়েদের

৭। মহাশ্বেতা দেবী—রচনাবলী নবম খণ্ড-দেজ-পৃষ্ঠা-৫৮।

৮। ঐ - পৃষ্ঠা - ১০৯।

৯। মহাশ্বেতা দেবী—রচনাবলী নবম খণ্ড-দেজ-পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫।

পাঁচালী গানের মধ্যে। গোরমেনকে সঙ্গে করে এনেছে চোট্টি। এরকম কাণ্ড আগে কখনো ঘটেনি। তাই গোরমেনের সামনে কি করতে হয় তা কেউ জানে না—তাই সকলেই প্রায় আতঙ্কে থাকে। সকলকে বাঁচায় পহানের বউ। মুন্ডা বউ হাঁসি মুখে দড়ি বাঁধা একটা ছোট্ট টুল এনে সাহেবকে বসতে দিল। তারপর বলল তোরা আয়া। গ্রামের মেয়েরা এগিয়ে এল। এখানে মুন্ডা সমাজের আতিথেয়তার রীতিটিও লক্ষ্যনীয়। একজনের হাতে পেতলের ঝকঝকে থালায় ভুট্টার খই। গুড়ের ডেলা। আরেকজন আনল জল।

বউ বলল, ঠাকুরথানে এসেছিল। একটু জল খা। তা বাদে আমারদের ছবি বানিয়ে দে। আসলে মেয়েরা পুরুষদের বেশ ইতস্তত অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। আর সাহেব যখন খেতে লাগল মেয়েরা মুখে মুখে গান বানিয়ে গাইল...

"ঘরে গোরমেন এসেছে
গোরমেন ছবি বানিয়েছে
গোরমেন বন্দুক লয়ে আসেনি
মোরাদেরকে মারেনি
গোরনে পরসাদ খেয়েছে"।[১০]

গানটি সাহেবের বেশ ভাল লাগে। তাই গানটি আরও একবার শোনে এবং লিখে নেয়। এইভাবে আমরা কিংবদন্তী বা গল্পের পাশাপাশি অসংখ্য গানের প্রসঙ্গ পাই যে গানগুলিতে তাদের মনের কথা, দুঃখ দারিদ্র্যের কথা, অসহায় যন্ত্রণার কথা যেমন আছে তেমনি আছে তাদের ভগবান স্বরূপ চোট্টিমুন্ডাকে নিয়ে প্রশংসা সূচক গান ঃ— যেমন ঃ—

১। তীর খেলা প্রতিযোগিতার চোট্টির গ্রামের ছেলেরা সব যুদ্ধে আটজন যখন জেতে তখন মেয়েরাও নাচে আর গায়—

"মেলায় চলহে মেয়ে, মেলায় চল—
আহা কে বলে রে কে বলে?
আমি তোর রূপে পাগল রে

এ চোট্টি নদী পারায়ে মোর হাত ধরনা কেন? মোরে মেলায় লয়ে চল"।[১১]

বোঝা যায় চোট্টি কিভাবে কিংবদন্তী হয়ে ওঠে। বোঝা যায় চোট্টির প্রতি মেয়েদের কি অকৃত্রিম ভালবাসা। চোট্টির আবেগও চাপা থাকে না। সে হরমুর মায়ের অবস্থা দেখে কোয়েলের সঙ্গে কথা বলে। কোয়েল তাকে বলে আজ আমাদের পরবের দিন। সেই পরবের দিনে ছেলারা গান গায়...কোয়েল নাগারায় চাটি বাজায়—

১০। ঐ - পৃষ্ঠা - ৪৮।

১১। মহাশ্বেতা দেবী—রচনাবলী নবম খণ্ড-দেজ-পৃষ্ঠা-৭১-৭২।

"তুমি ধনুক ওঠাও। তুমি নিশানা বিঁধ
তাতে দারোগা বড় ভয় হে—
তুমি যেয়ে গোরমেনেরে আর্জি জানাও
তাতে দারোগার বড় ভয় হে,
তাতে তোমারে তীর খেলতে দিল না।
তুমি তীর শিখালে দুখিয়া মুন্ডারে
বেঠ বেগার দুখিয়ারে হে—
দুখিয়া কাটে গোমস্তার মাথা
তাতে দারোগার ডর হে
তাতে তোমারে তীর খেলতে দিল না"॥
"কোন মুন্ডা জানে তীরের মন্তর?
একা তুমি জানো হে—
কোন মুন্ডা হয় গোরমেনের মিতা?
একা তুমি হও হে—
তাতে তোমারে তীর খেলতে দিল না"॥[১২]

গানটি চোট্টিরে লজ্জায় ফেলেদেয়। কেননা এটা তারই গুনগান কিন্তু এর মধ্য দিয়েই তারা একদিকে যেমন চোট্টির প্রশংসা করে তেমনি দিকুদের তীব্র ভর্ৎসনাও করে গানে গানে।

(২) শিকার পরবের গান—

গান গাইছে পহান। গোমস্তাকে দেখেও গান থামায় না। গেয়ে চলে, শিকার পরবের দিনে—

"পূর্ব দিকে ছিল বাঘ, তাহা মরদ বাঘ
বল্লমে বিঁধলাম তারে
শিকার পরবের দিনে গিয়াছিলাম বনে
তুমি ছিলে ঘরে গো
দরজা ধরে চেয়েছিলে পশ্চিমের পানে
আমি তো তখন পূর্বদিকে / শিকার পরবের দিনে গিয়াছিলাম বনে"।[১৩]

পহানের এই গানে একটা মিলনাকাঙ্ক্ষার সুর শোনা যায়। বিদেশে থাকা মনের মানুষের ঘরে ফেরার প্রতীক্ষায় তার লোকটি যেমন করে দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে

১২। ঐ - পৃষ্ঠা - ৭২।

১৩। মহাশ্বেতা দেবী—রচনাবলী নবম খণ্ড-দেজ-পৃষ্ঠা-৭৮।

থাকে কবে তার সেই জন আসবে তা ভেবে। মনে হয় পহানের কাছেও তার মনের মানুষ আসে। তাকে খাওয়ায় ভুট্টার ছাতু। ভুরাগুড়, আর জল। গান শেষ হলে পহানের শীর্ণ হাতটি ধরে ছাতুর ওপর রাখে। আস্তে বলে খাও। বোঝা যায় পহানের গানের সুরে তার এমন মনের মানুষ এসেছে যে তাকে খেতে বলেছে, এমন করে হয়ত এর আগে কেউ বলেনি। আর তাই পহানও যেন অনেক দূরে চলে চায়। দূর থেকে ভেসে আসা ক্ষীণ স্বরে সে বলে,

"চোট্টি, চোট্টিমুন্ডা—বিসরার ছেলে, এতোয়ার নাতি
সোমাইয়ের পুতি"।

চোট্টির বংশপরিচয় দিয়ে যায় পহান।

(৩) যে গানে চোট্টি নতুন হাতিয়ার পায়—

এই গানটি মূলত চোট্টিকে কেন্দ্র করে রচনা। যেখানে তার বীরত্বের কথাই বর্ণিত হয়েছে ঃ—

"তুমি ঘাস উঠায়ে নিলে
ঘাস হয়ে গেল বল্লম
বরাটারে বিঁধলে
বরাটা মরল তখনি
আর দারোগা
সে বলল, মহাবীর তুমি
যাও। সকল খেলায় নামো
তোমারে নিষেধ করে আমার এই শাস্তি"॥

কিন্তু আশ্চার্যের বিষয় এত কিছুর পরেও কেন মুন্ডাদের তীরথলালার ক্ষেত চষতে হয়, তবে পেটের ভাত জোটে। অর্থাৎ হয়ত নয় ছিল একদিন এমনই তাদের ক্ষমতা। ছিল ঘর, ছিল বন। কিন্তু তাদের সেখান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এই গানের মধ্য দিয়ে তাদের ইতিহাসকে বীরত্বের কথাকে লিপিবদ্ধ করেছেন মহাশ্বেতা দেবী।

(৪) দুঃখ ও বঞ্চনার গান—

নিজেদের জীবনের দুঃখ লাঞ্ছনার কথাকে গানে গানে বেঁধে রাখে মুন্ডারা। তার চোট্টির গান গেয়ে তারা ক্ষণিকের জন্য ভুলে যায় সব যন্ত্রণা—

(ক) "তীরথ নাথ বলেছিল সকল মুন্ডা খচড়াই
চোট্টি বলল, কথা ফিরাও হে
নয়তো বান মেরে তোমার খেত দিব জ্বালায়ে

তোমার গোলায় জ্বালাব হোলির আগুন
লালা লল ফিরালাম কথা
নাও করজ নাও ধান
করজ নাও ভুট্টা
মোর মুখ হতে অমন কথা বারোবেনা আর
সকল শুনে তবে চোট্টি তার বানগুলিরে ডেকে ফিরাল
বানগুলি নেচে উঠেছিল। ছুটে গিয়াছিল প্রায়"॥

(খ) "ঘরে হাঁথি চড়ায়ে দিল
বেঠবেগারী দিতে লয়ে গেল
তার ঘরে পরব, তাতে খাজনা নেয়।
করজ নিছিলাম। তাতে সকল ফসল লিয়া গেল"।

(৫) যে গান-মুন্ডা জীবনের ভরসা—

প্রাথমিক ভাবে গানগুলিকে চোট্টির জীবনে ব্যক্তিগত সাফল্য বলে মনে হলেও তা আসলে মুন্ডাদের জীবনের পরম ভরসা। বহুদিন পরে আদিবাসী ও ছগনদের সোহরাই উৎসবে শোনা যায় গান। গান শুনতে শুনতে চোট্টি কোয়েলকে বলে—শুনছিস কী বলে গানে গানে? কোয়েল মন দিয়ে শোনে গান ঃ—

"আধা ফসল আধা হকের জমি কাড়ি নিলে
হরমু আহা। সোনার ছেলে, তারে পাঠালে জেহেলে
ঘরে যেয়ে তীরের মান কথা বলে কে?
চোট্টিমুন্ডা কথা বলে—
তীর বাতাসে মিলায়ে ধেঁয়ে যায়
এখুন সকল যেন খেপা বাউরা হয়া যায়
নইলে বিদুর মাহাতো কেন জিতে চুলাওতে?
গোবিন্দ করন কেন পলায়ে যায়?
কেন ডাকাও পড়ে তোমার গদিতে?
আঃ আঃ আঃ 'তুমার কি হল?"

জমি মুন্ডাদের কাছে বড় প্রিয়, বড় প্রাণের। সেই জমি থেকে কোন মুন্ডা কোন দিন উৎখাত হতে চায় না। তারা জানে এক টুকরো জমির কী মূল্য ছোট্ট টকে ফালি জমি মানে নিজের স্রোতে ভাসা অস্তিত্বকে নোঙরে বাঁধা। সে জমি যতই ফালনা হোক, পাথুরে হোক। তারা জমিকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসে। পূজো করে, মুরগি বলি দেয়—রক্ত ছিটিয়ে জমির মঙ্গল করে। তারপর শুক্লপক্ষে চলে জমির পাথর

ও কাঁকর সরাবার কাজ। বর্ষার জল পড়লে তবে বোনা হয় ধান। এই ভাবে তারা পাথুরে জমির মাটিকে সোনায় পরিণত করে আর সে কাহিনী কে ধরে রাখে গানে, গানে, গল্পে কথায়।

কিংবদন্তী—

কিংবদন্তী হল সত্য মিথ্যা ও সম্ভাবনার ত্রিবেনী সঙ্গম। এখানে যে কাহিনী বিবৃত হয় মানুষ বিশ্বাস করে যে তাদের এলাকায় সেই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কিংবদন্তীতে ইতিহাসের ও ক্ষীণ সূত্রের সন্ধান মেলে। তবে পরে কাহিনী পল্লবিত হতে হতে ইতিহাস প্রায় মুছে যায়। থেকে যায় সম্ভব অসম্ভবের এক অপরূপ কাহিনী। যে মানুষ একদিন ত্যাগ-শোর্য-বীর্য দ্বারা সমাজে জীবিত অবস্থাতেই প্রায় দেবতা হয়ে ওঠেন তাঁর মৃত্যুর পর তাকে ঘিরে সম্ভব অসম্ভব গল্প রচিত হয়। জীবিত অবস্থাতেই তাঁকে নিয়ে কিংবদন্তী রচিত হয়। লেখিকা চোট্টি মুন্ডার জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজেই বলেছেন ঃ—

"সবই গল্প হে চোট্টি মুন্ডার জীবনে। মুন্ডাদের ভাষায় লিপি নেই। তাই দ্যোতক ঘটনাগুলিকে ওরা গল্প করে কিংবদন্তী করে। গান করে ধরে রাখে। সেটাই ওদের ইতিহাস বটে"।

দেখা যায় ধানী মুন্ডা থেকে বীরসা মুন্ডা হয়ে সেই গল্প কিংবদন্তী যেন চোট্টি মুন্ডার জীবনে ও প্রবাহিত হয়ে যায়। গল্পের যেন শেষ হয় না। চোট্টি মুন্ডা ভাল তীরন্দাজ। তীর খেলায় লক্ষ্যভেদ করার ব্যপারে তার জুড়ি মেলা ভার। যদিও কেবল অভ্যাস আর অধ্যবসায়েই চোট্টি ভাল লক্ষ্যভেদ করে কিন্তু কেউ সেকথা জানতে চায় না। সকলে বলে চোট্টি মন্তর জানে। ওর মন্তর পড়া তীর লক্ষ্যভেদ করেই। তাই চোট্টি কে সকলে ভয়ও করে। একটি ঘটনা চোট্টিকে সেই সঙ্গে আমাদেরও খুব অবাক করে। থানা আর দারোগা চোট্টির বাবাকে বিনা দোষে নির্যাতন করে। কিন্তু যখন চোট্টির কথা মনে পড়ে তখন আঁধার রাতে তারা তার বাড়িতে যায় এবং চোট্টিকে বাইরে ডেকে এনে হাত জোড় করে বলে বাবাকে বুঝিয়ে বল কিছু যেন মনে না করেন। আমরা জরিমানার পাঁচ টাকা দিয়ে যাচ্ছি। বন জঙ্গলে চাকরি করি তাই। বাড়িতে বউ বাচ্চা আছে—তাতেই ডর লাগে তোর তিরের কথা ভেবে। তোর তির পাঠিয়ে তুই আমাদের মারিস না। চোট্টি অবাক হয়ে যায়। বলে তোমাদের তো আমি মারব বলিনি। না না সবাই জানে তুই মন্তর জানিস। তোর তির ভেজে দিলে তা দশটা থানা পেরিয়ে মানুষ মেরে আবার তোর কাছে ফিরে আসবে। এই কথা বলে ওরা জরিমানার পাঁচ টাকা রেখে পালায়।

এই ভাবে চোট্টি মুন্ডার জীবন গল্প আর গানে গানে ভরে ওঠে—সে হয়ে ওঠে কিংবদন্তীর নায়ক। ঠিক যেমন করে ধানী মুন্ডা চিরকালীন হয়ে উঠেছিলেন সেই ভাবেই চোট্টি মুন্ডাও লোক সমাজের মনে একটা জায়গা করে নেয়। আলোচ্য উপন্যাসে লেখিকা ধানী মুন্ডাকে কেন্দ্র করে যে কিংবদন্তী তৈরী হয়েছিল তার সুন্দর বিবরণ দিয়েছেন এবং চোট্টি মুন্ডা তার উপযুক্ত শিষ্য হয়ে উঠেছেন। ধানী মুন্ডাকে কেন্দ্র করে আজ যে কিংবদন্তী তৈরী হয়েছে আগামী দিনে তাঁর'ই শিষ্য চোট্টিকে কেন্দ্র করে যে সেই ধারা অব্যাহত থাকবে—যেন তাঁরই ইঙ্গিত দিলেন লেখিকা ধানী মুন্ডার কিংবদন্তীর বর্ণনার কিংবদন্তীটি এই রকম—

মুন্ডা রায়ট কেসের আসামী ধানী মুন্ডা রাঁচি জেলে জেল খাটে। বেরোবার পর তাকে রাঁচি ও চাইবাসা থেকে বাইরে থাকার নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয় টাহাড় থানার অধীনস্থ মুরুডি গ্রামে। মুরুডিতে পুলিশ চৌকি আছে। ধানী বিপজ্জনক আসামী। তার বিষয়ে পুলিশ চৌকিকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। তার আন্তরিক অবস্থায় থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা যে বিশ্বাস করে বীরসার জেলে বসে বলা প্রলাপ, আমি আবার ফিরে আসব, মৃতের প্রলাপ ধানী মুন্ডা বিশ্বাস করে। ধানীর হাতে কোনো অস্ত্র থাকাও ঠিক নয়।

একদিন ধানী নিরুদ্দেশ হয় যায়। টাহাড় থানা অত্যত বিপদে পড়ে। কিছুতে তার হদিশ মেলে না। রাঁচী ও চাইবাসাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। অনেক খোঁজা খুঁজির পর চাইবাসা মিশনের জনৈক মুন্ডা-আগ্রহী মুন্ডারী-জানা ফাদার বলে বীরসার মৃত্যুদিনে বীরসার প্রাক্তন সহযোদ্ধারা সৈলরাকাবে যায় ও তাকে গোপনে স্মরণ করে। জুন মাসে বীরসার মৃত্যুদিন যেমন এগোতে থাকে, বহু ধানী মুন্ডা ধরা পড়তে থাকে, কিন্তু ধানী নাম অনেকের হওয়ায় যারা ধরা পড়ে তারা কেউ আসল ধানী মুন্ডা নয়। ক্রমে মনে হতে থাকে সমগ্র ঘটনাটি বানানো গল্প হয়তো।

সবাই কেমন ঝিমিয়ে পড়ে। একদিন বিকেলে হঠাৎ বিশাল চাঞ্চল্য দেখা যায়। ধানী মুন্ডা আসছে বলে সিপাই জানায়। হেড কনস্টেবলকে নিয়ে দারোগা ছুটে আসে এবং এক অনন্য সাধারণ দৃশ্য দেখতে পান। দেখে ভীষণ ভয়ে বন্দুক বাগিয়ে ধরেন।

এক হাতে বলোয়া ও অন্য হাতে ধনুক মাথার ওপর তুলে ধরে এক ক্ষীণ অথচ পাকানো দেহ বৃদ্ধ মুন্ডা এগোচ্ছে। তার দুপাশে আদিবাসী জনতা। সে হেঁকে বলছে, আমি ধানী মুন্ডা। আমারে খেদায়ে দিয়াছিল, আমি আবার এসেছি। কুথায় থানা? আমি কোনো থানা দেখো যাই নাই। আমি কোনো নিষেধ জানি না হে, আমি এসেছি।

১৪। মহাশ্বেতা দেবী—রচনাবলী নবম খণ্ড-দেজ-পৃষ্ঠা-৮০।

মুণেশ্বর সিং চেঁচিয়ে ওঠে বলে—থামো, দাঁড়াও।

'ধানী নিদন্ত মুখের জরা বলি গুলি কাঁপিয়ে শিশুর আনন্দে হাসে ও বলে কুন-অ-পুলিশ মোরে রুখতে পারে না। আমি এসেছি হে। আমি সেই ধানী মুন্ডা?

সকলের সঙ্গে তার আলাপহয়, কনু-সালী, পরিবার খোঁজে নেয় ধানী। বুড়োড়া বুড়োদের সম্মান জানায়, সম্ভাবষণ করে। অপর দিকে মুনেশ্বর সিং এর মধ্যে আরেক মুন্ডা অভ্যুত্থানের ভীষণ সম্ভাবনা দেখতে পায়। ধানী দুরন্ত উল্লাসে বলোয়া ও ধনুক শূন্যে ঘুরিয়ে নেচে বলে আমি ঘরে ফিরেছি হে—সে নিচু হয়ে বসে পড়ে। ধুলা খাই, ঘরের ধুলা খাই। ঘরের মাটিতে ভাতের সুবাস হে! মাটি খাই! সত্যি সত্যি সে মাটিতে মুখ ঘষে আর তাই দেখে ডোনকা কেঁদে ফেলে। ধানী হাসে ও কাঁদে, মুনেশ্বর সিং ধানীর মাথার গুলি চালায়।

এই ভাবে ধানী মুন্ডার মৃত্যু ঘটে।

লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী দেখিয়েছেন যাদের লিখিত ইতিহাস নেই সেই সব মুন্ডারা ধানী কাহিনীকে বীরসার কাহিনীর সঙ্গে মিশিয়ে গান বাঁধে। ধানীকে মুন্ডারা কিভাবে চিরকালীন করে তুলেছে তা দেখানো হয়।

কাহিনিটি পুলিশের চেইনে-মুরুডি পৌঁছয় ও ক্রমে চোট্টি জানে। চোট্টির জীবনের সঙ্গে এই ভাবে গল্পের পর গল্প যুক্ত হয়—সেও ধীরে ধীরে কিংবদন্তী হয়ে ওঠে।

পহানের বনে ঢোকাটা প্রতীকী। সেই সঙ্গে উষা ও রাতের সন্ধিক্ষণে কুমমি গ্রামের মুন্ডাদের কাহিনি শেষ হয়ে যায়। তোমরা মিশনের যোসেফ সুখা মুন্ডা, দাউদ বিখ্না মুন্ডাদের কাহিনি আলাদা। সৃষ্টি হয় যে কিংবদন্তী সেখানে আমরা দেখতে পাই দিকুনেদর জোর-জুলুম ও অত্যাচারের কাহিনী-গল্প-গান ঃ—

"বড় জুলুম উঠায়ে ছিল দয়ালরাজ গোমস্তা
কুরমির মুন্ডাদের বেঁধেছিল বেঠ বেগারীতে
বেঠ বেগারী দিতে দিতে দিতে দিতে—
সুখা মুন্ডা গিয়েছিল চোট্টি মুন্ডার কাছে।
চোট্টি ভোজ দিল তীর তোমারু মিশনের দিকে
বলে দিল, তীরের পাছে পাছে যা।
চোট্টি ভেজে দিল আগুন মুখাতীর
কুরমিতে জ্বলল হোলির আগুন।
চোট্টি ভেজে দিল তীর পহানের কাছে
পহান তীরে চেপে চলে গেল অনে-ক দুর"।[১৪]

কিংবদন্তীর এই গল্পকে মুন্ডারা বিশ্বাস করে। গানের মধ্য দিয়ে দেখা যায় বড় জুলুম-অত্যাচারের নির্মম বর্ণনা আছে এখানে। আর তার সঙ্গে আছে উদ্ধার কর্তা

চোট্টি মুন্ডার অপার মহিমা। তার জন্যই মুন্ডাদের জীবনে আবার শান্তি ফিরে আসবে এই বিশ্বাসে তারা কিংবদন্তী-গান-গল্পকে বাঁচিয়ে রাখে, হয়ত তাই। নইলে এই কিংবদন্তী—গল্প বা গানের গুরুত্বই কোথায়। আমরা দেখি বছর দেড়েক বাদে কুরমি গ্রামে নতুন করে প্রজা পত্তনি হয়। জঙ্গল আবাদ করে তারা ঘর তোলে সবাই। কুরমিতে প্রথম ফলন হয়—আদিবাসীরা তাদের প্রথম ফলন সূর্য দেবতাকে দেয়। গ্রাম আবার আগের মত অবস্থায় ফিরে আসে। ছাগল চরে, কুকুর ডাকে ঘরের চালে মুরগি, উঠোনে ন্যাংটো ছেলেদের কলরব, জীবনে কোন কিছু শূন্য পড়ে থাকতে পারে না। পূরণ হয়ে যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

(১) ঘোষ নির্মল—মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদীমুখ ঃ করুণা প্রকাশনী, কলকাতা—১৯৯৮।
(২) চৌধুরী অরুণ—আদিবাসী জীবন ও সংগ্রাম ঃ গাঙচিল ২০১৩।
(৩) চৌধুরী অরুণ—সাঁওতাল অভ্যুত্থান ও উপজাতীদের সংগ্রাম ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৫।
(৪) চৌধুরী অভিজিৎ—মহাশ্বেতার মহাবিশ্ব ঃ করুণা প্রকাশনী, কলকাতা—২০১০।
(৫) চৌধুরী মোমেন—লোকসংস্কৃতি ও বিবিধ প্রসঙ্গ ঃ বাংলা আকাডেমি, কলকাতা-১৯৭৭।
(৬) চৌধুরী দুলাল—(সম্পাদিত) বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ ঃ আঃ আঃ ফোকলোর।
(৭) চক্রবর্তী বরুণ কুমার—লোকসংস্কৃতি রচনাপঞ্জী ঃ কলকাতা ১৯৯৫।
(৮) চক্রবর্তী বরুণ কুমার—লোককথার সাতকাহন ঃ অপর্ণা বুক ডিসট্রিবিউটর— ২০১১।
(৯) চট্টোপাধ্যায় সৌগত-লোকসংস্কৃতির অন্দরমহল বারমহল ঃ কলকাতা—২০১০।
(১০) চক্রবর্তী রামী-মহাশ্বেতার নারী পরিসর ও অন্যান্যঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা—২০০৯।
(১১) দাস অরূপ কুমার—অরণ্যের অধিকার ইতিহাসের কণ্ঠস্বর, কলকাতা—২০০৮।
(১২) দেবী মহাশ্বেতা-দশটি উপন্যাস ঃ করুণা প্রকাশনী, কলকাতা—২০০২।
(১৩) দেবী মহাশ্বেতা-মহাশ্বেতাদেবী রচনাসমগ্র ঃ দে'জ, কলকাতা—২০০২।
(১৪) নন্দী রতনকুমার (সম্পাদিত)-অরণ্যের অধিকার মানুষের উত্থান ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ—২০০৯।
(১৫) বিশ্বাস কনিকা-ছায়াদর্পণে মহাশ্বেতা ঃ এবং মুশায়েরা, কলকাতা।
(১৬) বন্দ্যোপাধ্যায় সুভাষ-বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান ঃ করুণা প্রকাশনী, কলকাতা—২০০৫।
(১৭) বন্দ্যোপাধ্যায় সুমহান-প্রসঙ্গ আদিবাসী ঃ অফবিট পাবলিকেশন, কলকাতা—২০১২।
(১৮) ভট্টাচার্য তপোধীর—আখ্যানের সাতকাহন ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা—২০১৩।
(১৯) মজুমদার মানস-লোকঐতিহ্যের দর্পণে ঃ কলকাতা—১৯৯৩।
(২০) মজুমদার কামনা, মণ্ডল উৎপল-মহাশ্বেতার গল্প ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা—২০১৩।

(২১) মণ্ডল শুধাংশু শেখর-ইতিহাস থেকে উপন্যাস অরণ্যের অধিকার ঃ বামা পুস্তকালায়।
(২২) সেগুপ্ত পল্লব-লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ ঃ কলকাতা—১৯৯৫।
(২৩) সিদ্দিকী আশরফ-লোকসাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড) ঃ গতিধারা, ঢাকা।

পত্র-পত্রিকা ঃ

(১) অমৃতলোক ১০৩ সংখ্যা, সম্পাদক সমীরণ মজুমদার, 'মহাশ্বেতার আখ্যানবিশ্ব-ইতিহাসের মনন ঃ তপোধীর ভট্টাচার্য, তৃতীয়বর্ষ ২০৩ সংখ্যা মার্চ ২০০৫।
(২) শিল্পসাহিত্য ১ম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, সম্পাদক অনিন্দ সৌরভ 'অলৌকিক বাস্তবঃ চোটিমুন্ডা এবং তীর' ঃ সুমিতা চক্রবর্তী, জানুয়ারী ২০০৯।
(৩) জনপদপ্রয়াস পঞ্চমখণ্ড ২-৩ সংখ্যা ঃ সত্তরের দশক ও তারপরে ঃ মহাশ্বেতা দেবী।

আলতামিরা তোমার তুলনা তুমি